অল্প স্বল্প গল্প

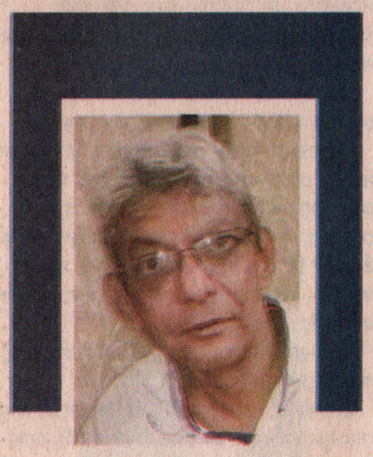

গৌতম সেনগুপ্ত

talpata.bookpublishing@gmail.com

ভূমিকা

"...ইতিহাস মানে প্রমাণের নিগড়ে বাঁধা এক উদ্ভট জন্তু, মানুষের ভাল-মন্দে যার কিছু যায়-আসে না। সাহিত্য আর দর্শন নিয়ে আজ অবধি যেসব কাজ আমি করেছি এককথায় বললে তা ভাষার মায়াকুহকে আচ্ছন্ন অবান্তর আবর্জনা ছাড়া কিছুই নয়। আমি এই সমস্ত কিছু থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। চাই স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে। প্রশ্ন তুলতে। এখন আমার আগ্রহ শুধুমাত্র নীতি-নৈতিকতা ও ঔচিত্যের ইতিহাসে। যে কারণে আমার এবারের উপন্যাস 'লোম মিস্টেরাট' (দ্য মিস্টিরিয়াস ম্যান)-এর নায়ক আফিন্দি বা মোল্লা নাসিরুদ্দিন। এখানে সে ভাঁড় নয়। মরমিয়া সাধক কি? আমার লেখায় আমি সেসবেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।..."

উপরের লেখাটা 'আফিন্দি দি আলটিমেট লক্যুনা: হাইপার রিয়েলিটি অ্যান্ড আদার মিস্ট্রিজ অফ দ্য মিডিয়াভ্যাল পিরিয়ড' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ। লেখক জানেমানে ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক জেরমি হক। পুরনো ছাত্রের এরকম একটা লেখায় যারপরনাই বিরক্ত হয়েছিলেন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ফেরন্যাঁ ব্রদেল। তাঁর মতে, 'সু' বা 'কু' বিচারের জায়গা ইতিহাস নয়। সে চলে প্রমাণের ভিত্তিতে। সেখানে ছেলেভোলানো রূপকথার কোনও জায়গাই নেই। একইসঙ্গে হকের মাথার সুস্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছিলেন ব্রদেল।

মানুষ হিসাবে হক বরাবরই একলাটেরে। স্যারের চিঠির পর নিজেকে আরও বেশি গুটিয়ে নিলেন। এই সময় থেকে তাঁর আচরণেও নানা অসংগতি দেখা যেতে লাগল। গ্লোবালাইজেশনের দর্শন নিয়ে তাঁর একাধিক বই আছে। সে-বিষয়ে একজন প্রশ্ন করায় অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিলেন— তুরস্কের আনাতোলিয়া অঞ্চলের আক্ শেহরে মোল্লার মকবরাটা আছে। শুনেছি শহরে থাকলে মোল্লা নিজেই এর দেখভাল করে। সত্যিই তো, তোমার সমাধি তুমি নিজে না দেখলে আর কেই বা দেখবে?

তখন তাঁকে দেখা যেত বেশি রাতে। সম্পূর্ণ মত্ত অবস্থায় শেন নদীর ধার ঘেঁষে হাঁটছেন। সঙ্গী এক বেঁটেখাটো লোক, মাথায় উদ্ভট পাগড়ি। বিটের পুলিশ থেকে রাতজাগা ভিখিরি সকলেই বলত— ব্যাটা নির্ঘাত একদিন ডুবে মরবে।

হলও তাই। এটা দুর্ঘটনা না আত্মহত্যা এই নিয়ে ক'দিন লেখালেখিও হল। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল পাণ্ডুলিপিটার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। সত্যিই লিখেছিলেন কি না এই নিয়েও প্রশ্ন উঠল। প্রকাশক গালিমার অবশ্য জানাল, মৃত্যুর ৯ দিন আগে লেখা চিঠিতে হক জানিয়েছিলেন, পাণ্ডুলিপি প্রায় তৈরি।

ব্যাপারটা কী বোঝা গেল না। ধীরে ধীরে সবাই ভুলেও গেল। মাসখানেক আগে আমার পুরনো বন্ধু হরিশ প্যারিসের এক নিলামঘরে নানা রদ্দি কাগজের ভিড়ে আচমকাই সেই অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটির দেখা পায়। পরদিনই সে গোটাটাই আমাকে মেল করে। নিচের টুকরো দুটো ওই লেখারই তরজমা।

১

লন্ডন, ৮ জুন, ১৮৭০। বছরখানেক আগেই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন চার্লস ডিকেন্স। ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েই শুরু করেছেন নতুন উপন্যাস 'দ্য মিসট্রি অফ এডউইন ড্রুজ'-এর কাজ। আচমকাই পুরনো বন্ধু নাসিরুদ্দিন হাজির। এসেই খোঁচা, তুমি না কি এই ভাষার গর্ব? তুমি আছ বলেই ভাষাটা আছে? এই শহরের সমস্ত মানুষজন, গলিগলতা ধরা আছে তোমার লেখায়?

মাথা নাড়েন ডিকেন্স, লোকে বলে গোটা লন্ডন, তার সমস্ত ম্যাপও যদি লোপাট হয়ে যায়— তাহলে শুধু আমার লেখা থেকেই তা ফের তৈরি করে নেওয়া যাবে।

—তাই? তা চলো, একটু ঘুরে দেখি তোমার শহর।

রাতের শহরে হাঁটছেন দুই বন্ধু। হঠাৎ থেমে মোল্লা বলে, ওই মেয়েটা, নেভা আগুনের পাশে বসে আছে, ওই কমবয়সি বেশ্যার দল এখনও আশায় আছে খদ্দেরের বা ওই একরত্তি বাচ্চাটা মরা মায়ের বোঁটা চুষছে প্রাণপণ— এদের চেনো তুমি? এদের কথা আছে তোমার লেখায়? দু'-দশদিন বা দু'-পাঁচ বছরের মধ্যেই এরা মরবে, পড়ে থাকবে আবর্জনার গাদায়। তুমি তখন ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিতে দিতে মেতে উঠবে লেখার খেলায়।

ঠিক তাই, শুকনো মুখে মাথা নাড়েন ডিকেন্স, দু'পয়সার কলমপেষা মজুর আমি...

তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই মোল্লা বলে, আমি তো শুধু তোমার বন্ধু নই, ভক্তও। তবে কী জানো, মাথাটা কাটা পড়ার পর থেকেই মাঝে মাঝে এমন গোলমাল হয় না...

—মাথা কাটা? ব্যাপারটা কী?

—তখন শহরজুড়ে হইচই। শেষ শয্যায় প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর পোশাক আমাকে দিয়ে যেতে। যারা দিতে এসেছে, আমার মতো চালচুলোহীন ভবঘুরে দেখে তো তাদের চক্ষু চড়কগাছ! বলে, 'আপনি কি কখনও ওঁর সেবক ছিলেন?' 'সেবক? তাঁকে চোখে দেখার সৌভাগ্যই হয়নি।' 'তাহলে?' তখন ওদের দাঁত দেখতে চাইলাম। দেখি সবারই মুখভরা ঝকঝকে দাঁতের সারি। তখন নিজের ভাঙাচোরা দাঁতগুলো দেখিয়ে বললাম, "শুনেছিলাম শত্রুরা ওঁর দাঁত ভেঙে দিয়েছে। কোনটা জানি না বলে নোড়া দিয়ে নিজের সবক'টা দাঁত ভেঙে দিয়েছিলাম।"

এসব কথা তো আর চাপা থাকবে না। শুরু হল ভিড়। পালাতে পালাতে হাজির হলাম কুম্বি সালহেতে। সুলতান কঙ্কন মুসার রাজ্যে। সুলতান ভয়ংকর। কিন্তু আমি তো থাকি শহর থেকে দূরে। চাষবাস করে দিন কাটাই। কিন্তু কপাল খারাপ হলে যা হয়। শুরু হল খরা। পণ্ডিতরা বিধান দিলেন, কোণের বাড়ির বাঁজা বউটাকে বলি দিলেই নাকি সব দোষ কেটে যাবে। ঠেকানোর বহু চেষ্টা করলাম। কেউ পাত্তাই দিল না। বাধ্য হয়ে হাঁক দিলাম মেঘেদের। হাজির হল কালো মেঘের দল। নামল আকাশভাঙা বৃষ্টি। আমাকে নিয়ে মেতে উঠল লোকজন।

কথাটা সুলতানের কানেও উঠল। তিনি পাইক পাঠালেন। তারা নিয়ে চলল শিকল বেঁধে। আমার বারণ না শুনেই বাধা দিল গাঁয়ের লোক। হুকুম হল, সবক'টাকে ফাটকে পোরার। শোনা গেল, পরদিন ভোরে গর্দান যাবে সবার। প্রতিবাদ ভুলে তখন কান্নাকাটি, কাকুতি-মিনতি, মাথা-কপাল কোটা। আর না পেরে গরাদগুলো আর পাঁচিলটাকে বললাম সরে যেতে। সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল সবাই। যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি?' 'উপায় নেই রে ভাই! কাল জল্লাদ এসে একটা প্রশ্ন করবে যার উত্তর শুধু আমিই জানি।'

পরদিন ভোরে সব দেখেশুনে জল্লাদ বলে, 'কিন্তু তুমি গেলে না কেন?' 'কী করে যাব? সুলতান-টুলতান আমি মানি না। আমি তাঁর গুলাম। বিশ্বাস করি, সবকিছু তাঁর নির্দেশেই হয়। এতকাল বাদে উনি আমার কাছে কিছু চেয়েছেন। নিজের গর্দান বলে তা না দিয়েই চলে যাব?'

'তারপর?' ডিকেন্সের প্রশ্ন। 'তারপর আর কী, ঘচাং ফু, মুন্ডু কেটে মাটিতে।' 'কিন্তু তুমি তো বেঁচে আছ?' আমতা-আমতা করে বলেন ডিকেন্স। আলতো করে তাঁর পিঠে হাত রেখে মোল্লা বলে, 'আরে ইয়ে জিনা ভি কোই জিনা হ্যায় রে চার্লস।'

সম্ভবত এর অভিঘাত সামলাতে না পেরে পরদিনই ম্যাসিভ স্ট্রোকে মৃত্যু হয় মহান লেখক ডিকেন্সের।

২

গাধায় ওঠার মুখে এক বিচিত্র চেহারার জীব এসে হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে মোল্লার। সে নাকি মৃত্যুর দূত! 'তা, আমি কী করব?' খিঁচিয়ে ওঠে মোল্লা। 'হুকুম হয়েছে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার।' এটা আবার প্রভুর নতুন কী খেলা? হঠাৎই মনে পড়ল আজ জিলহজ্ব মাসের পয়লা। আজ বধ্য পশুর রক্তপাত ছাড়া কোনও কিছুই প্রভুর প্রিয় নয়। শুরু করল পেটাতে। প্রায় শেষ অবস্থায় ঘোষণা হল, "হাত রাখো ওর তালুতে। তোমার হাতের নিচে চাপা পড়বে যে ক'টা চুল, তত সহস্র বছর বর্ধিত হবে তোমার আয়ু।" 'তারপর?' 'তারপর সবার যা হয়।' 'তবে তা এখনই হোক'। হাঁটা দেয় মোল্লা।

স্বর্গের পথ সোজা নয়। পেরতে হয় চুলের চেয়ে সরু, তরোয়ালের চেয়ে ধারালো পুলসেরাত। দমকা হাওয়ায় বহু কষ্টে ব্যালান্স করে চলছিল মোল্লা। মুখ তুলে দেখে তার আগে যাচ্ছে এক লোলচর্ম ভিক্ষুক। আমার আগে! বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই মেঘ ফুঁড়ে ভেসে আসে স্বর। 'তোমাদের শরীর থেকে একপাউন্ড করে মাংস দাও আমাকে।' শোনামাত্র কোমর থেকে ছুরি বের করে কলজেটা তুলে আনে মোল্লা। তারপর দেখে ভিখিরিটা সারা গা থেকে চাক চাক মাংস কেটে জমা করছে ঝুলিতে। 'এটা কী হচ্ছে?' শান্তভাবে ভিক্ষুক জানায়, 'আমি তো জানি না কোন অংশের মাংস ওঁর পছন্দ।'

ভাঙা মন নিয়ে আত্মজীবনী লেখার জন্য তিনমাসের ছুটি মঞ্জুর করিয়ে ফিরে এসেছে নাসিরুদ্দিন। শুরু করেছে তার বাবা কাজি গিয়াসুদ্দিনের কথা দিয়ে। জানালার ধারের গাইটিকে বললাম, হে ভগিনীতরু, আমাকে বাবার কথা স্মরণ করাও। ফুলে ভরে উঠল ডাল। মাথা নামিয়ে কানের কাছে মুখ এনে বলল, যে দেশে রাজা রাজার মতো, মন্ত্রী মন্ত্রীর মতো, সেই দেশে শস্য হলে কি তার একদানাও প্রজারা পায়? মনে রেখো, জল কম হলে নামতে হয় কাপড় বাঁচিয়ে, নাকের উপর উঠলে কিন্তু কাপড়ের তোয়াক্কা করা চলে না।

বাবার অধ্যায় সেরে ভুবন-কাঁপানো তাত্ত্বিকদের সঙ্গে মোলাকাতের কথা শুরু করেছে মোল্লা। তেমনই একজনকে রাস্তায় দেখে প্রশ্ন করে, 'কোথায় চললেন?' 'হাওয়া যে দিকে ধায়।' 'হাওয়া কি আর একদিকে ধায়। ধরুন যদি হাওয়া না-ই থাকে?' 'তখন বলব পা যেদিকে যায়।' 'পা কি আর একদিকে যায়? ধরুন যদি আপনার পা না-ই থাকে?' 'তখন বলব চোখ যেদিকে চায়।' 'চোখ কি আর একদিকে চায়। ধরুন যদি...।' খিঁচিয়ে উঠে তাত্ত্বিক বলেন, 'তখন বলব বাজারে যাচ্ছি।' আলতো চোখ মেরে মোল্লা বলে, 'কথাটা আগে বললেই হত।'

একেবারে শেষ অধ্যায়ে গোর দেওয়া হচ্ছে মোল্লাকে। কবরে শুয়ে সে বলছে, আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হওয়ার কথা। 'নিছক আনুগত্য নয়। প্রশ্ন করতে হবে, ক্রমাগত প্রশ্ন করতে হবে। একমাত্র প্রশ্নই পারে আমাদের প্রকৃত সত্যের কাছে পৌঁছে দিতে।' এই অবধি সব ঠিকই ছিল। গোল বেধেছে সমাধিফলকের উপরের লেখাটি নিয়ে। হাজার ভেবেও কোনও কূলকিনারা করতে পারছে না। ঠিক এই সময় উপরওয়ালার কৃপায় কবি এসকাইলাস এসে হাজির। বললেন, 'প্রেয়সীর মৃত্যু দিয়ে শেষ হবে আমার কবিতাটা। ঈশ্বরের সংলাপটা হয়ে গিয়েছে। জবাবে আমি বলব মাথায় আসছে না।' 'হঠাৎ আমার কাছে কেন?' "পুরনো চিনে কবিতার ঢঙে আপনি যেগুলো লিখেছিলেন আমি তো আর রীতিমতো ভক্ত। প্রথম দু'লাইনে শব্দ আর বিষয়ের মিল থাকবে। তৃতীয় লাইনে বলা হবে সম্পূর্ণ নতুন কিছু। চার নম্বর লাইন জুড়ে দেবে সবক'টাকে। কবে পড়া, আজও মুখস্থ আছে।" 'তাই?' ডিলান টমাসের মতো হুইস্কি-ভেজা গলায় শুরু করেন এসকাইলাস, 'সেই এক মেয়ে তার বাড়ি আক্ শেহরে/ পাগল দিওয়ানা দল পাক খায় বাহিরে/ খুনিরা করে তো খুন ছুরি বা ছোরায়/ সেও করে খুন যদি আড়চোখে চায়।' হাসিমুখে মোল্লা বলে, 'দেখি আপনার পাণ্ডুলিপি। তবে আমার আত্মজীবনীর শেষটায়, সমাধিফলকের লেখাটা নিয়ে জেরবার হয়ে আছি। ওটা যদি...।' 'ও কোনও ব্যাপারই নয়। আত্মজীবনীটা দিন। একটু চোখ বুলিয়ে নিই।' এসকাইলাসের লেখায় মন দেয় মোল্লা, 'ঈশ্বর: এই অত্যাশ্চর্য সুন্দরী এখন আর তোমার নয়। ঘন কুয়াশার মতো মৃত্যু ঢেকে দেবে ওর সর্বাঙ্গ। শেষবারের মতো দেখে নাও ওই অপরূপ মুখশ্রী। দেখো, কী স্বর্গীয় আভা ফুটে উঠেছে সেখানে।'

মোল্লা বলে, আপনার সংলাপ হবে, "কোনও দয়া নয়। অনুকম্পা বা সহানুভূতিও নয়। যেটুকু সময় একসঙ্গে ছিলাম তাকে মর্যাদা দিও। মর্যাদা দিও আমাদের ভালবাসাকে। আর যদি পারো ওই কুয়াশার পাশে বসে ওর জন্য চোখের জল ফেলো দু'ফোঁটা।"

বুকে জড়িয়ে ধরেন এসকাইলাস।

তারপর বলেন, সমাধিফলকের লেখাটা হবে, 'প্রত্যাশা নেই কোনও কিছুর। ভয় পাই না কাউকে। আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন।'

অলংকরণ শান্তনু দে